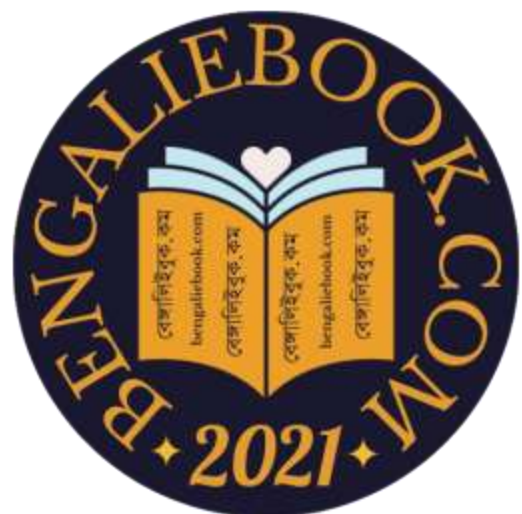


অঙ্গত রচনা

কবিতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



কোরেল

এক

লন্ডন নগরের পঞ্চাশৎ মাইল উত্তরে কোরেল নামে একটি গ্রামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরস্থ দুইখানি অটালিকা গ্রামের শোভা শতগুণে বর্ধিত করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ের সৌন্দর্যে একটা সাদৃশ্য থাকিলেও একটি অপরটি অপেক্ষা এত বৃহৎ জমকাল এবং মূল্যবান যে, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রাজা তাঁহার যৌবনের প্রথমাবস্থায় একটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর যত দিন গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সুখসম্পদ পরিব্যাপ্ত আত্মসুখ যেদিন মরণের ছায়াটা সম্মুখে ঈষৎ হেলাইয়া ধরিয়াছিল, সেই দিন হইতে বোধ হয় অপরটির নির্মাণকর্ম আরম্ভ করাইয়াছিলেন। তাহাই যৌবনে এবং বার্ধক্যে যেরূপ প্রভেদ, এই দুইটি অটালিকার মধ্যেও সেইরূপ একটা প্রভেদ লক্ষিত হইত। একটি তাঁহার বিলাসভবন, রাজসভা, অপরটা তাঁহার শান্তিনিকেতন, কুঞ্জকানন। একটিতে কত মর্মরপ্রসূর, কারুকার্যশোভিত কত ঝরনা, রঞ্জিত পত্রপুষ্পগঠিত কুঞ্জবন, তাহার পর তোষাখানা, অশ্বশালা, পশুশালয় গ্রামের মত চতুর্দিকে ঘেরিয়া আছে, আর ভিতরে কত আসবাব! কত টেবিল, চেয়ার, পিয়ানো প্রভৃতি বহুমূল্য কার্পেটের উপর দাঁড়াইয়া আছে- ভিত্তিসংলগ্ন বৃহৎ মুকুরে সে শোভা সহস্রবার প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার উপর কত রকমের চিত্র, নানাবিধ ঝাড়-লগুন দেয়ালগিরির মধ্য দিয়া স্ব স্ব সৌন্দর্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপরটিতে অত কিছু নাই। বাইরে শুধু শ্যামল তৃণদল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পুষ্পতরু, লতাবিতান, একঝাড় পিয়ার বৃক্ষ, একদল আঙ্গুরের কুঞ্জবন মধ্যে দুই একটি বসিবার বেঞ্চ; নদীর ধারে দুই ঝাড় বংশবাটিকা, তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র অটালিকাখানি নদীতীর হইতে ঈষৎ দেখা যায় মাত্র।

দুইজন প্রাচীন সৈনিক এই দুই ভবনের অধিকারী। একজনের নাম ক্যাপ্টান নোল; অপরের নাম কর্নেল হ্যারিংটন। যুদ্ধকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুই বন্ধু নির্জনে এই দুটি অটালিকা সামর্থ্য অনুসারে ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন। Captain Noll- এরও একটি মাত্র কন্যা-নাম মেরি; Colonel Herrington-এরও একটি মাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম লিওপোল্ড-জননী আদর করিয়া লিও বলিয়া ডাকিতেন।

একদিন লিওর জননী পুত্রকে শিয়রে বসাইয়া মেরিকে আশীর্বাদ করিয়া স্বামীর কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া বসন্তপ্রভাতে সূর্যোদয়ের সহিত হাসিমুখে চিরদিনের মত প্রস্থান করিলেন। লিওর তখন দশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম;—খুব কাঁদিতে লাগিল। মেরির জননী আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, ‘ভয় কি বাবা, আমি চিরদিন তোমার মা হইয়া থাকিব।’ সপ্তবর্ষীয়া বালিকা মেরি লিওর হাতে ধরিয়া বলিল, ‘লিও কাঁদিও না—চুপ কর।’ লিও চুপ করিল।

স্ত্রীবিয়োগের পর কর্নেল হ্যারিংটন জুয়াক্রীড়ায় নিতান্ত মনঃসংযোগ করিলেন। সন্ধিত অর্থ যত সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, প্রবাসী পুত্রমুখ স্মরণ করিয়া তত অধিক উৎসাহের সহিত নষ্ট ধন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় জুয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত নিঃশেষ হইয়া আসিল, ক্রীড়ার মত্ততায় তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বন্ধু নোলের নিকট বাটী বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলেন! তাহাও শেষ হইল—দারুণ নিরাশায় তাঁহার উন্মত্ততা আসিল, একদিন রাত্রে খাইবার সংস্থান পর্যন্ত নাই—আর সহ্য হইল না—বন্দুকে গুলি ভরিয়া আত্মহত্যা করিলেন। পুত্র লিও তখন লন্ডনে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল—সংবাদ পাইয়া বাটী আসিল। মেরির জননী তখন জীবিত নাই। ক্যাপ্টান নোল মৌখিক সান্ত্বনা মাত্র করিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয় লিও অকূলসমুদ্র দেখিয়া যখন ছটফট করিতেছিল,

নিরতিশয় মমতায় করুণ অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দুটি লিওর মুখের পানে রাখিয়া তাহার হাত ধরিয়া মেরি কহিল, ‘লিও ভয় করিও না—তোমার মেরি এখনও মরে নাই।’

এ কথার অর্থ সবাই বুঝে,—লিও অন্তরে আশীর্বাদ করিয়া মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, ‘তাই হউক—জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন।’

কিন্তু সেবার দুইজনেরই বড় দুর্বৎসর পড়িয়াছিল,—অধিক দিন না যাইতেই ক্যাপ্টান নোল জ্বরবিকারে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন মেরি লিওর বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ‘লিও শুধু তুমি রহিলে—বিপদে-সম্পদে আমাকে রক্ষা করিও।’

লিও চক্ষু-দুটি মুছাইয়া দিয়া বলিল, ‘করিব।’

‘প্রতিজ্ঞা কর কখন পরিত্যাগ করিবে না।’

‘প্রতিজ্ঞা করিলাম।’

মেরি মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, ‘তবে আর কাঁদিব না;—আমার সব আছে।’

দুই

লিও একখানি পুস্তক লিখিয়াছিল। লন্ডন নগরে তাহার একজন বন্ধু ছিলেন। সমালোচনার জন্য হস্তলিখিত পুস্তকখানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিছুদিন পরে এইরূপ উত্তর আসিল, ‘বন্ধু, তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। তোমার লিখিত পুস্তকখানি একজন পুস্তক-প্রকাশকের নিকট কতকটা বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়াছি। পাঁচ শত পাউন্ড পাঠাইলাম—রাগ করিও না, ভবিষ্যৎ উন্নতির বোধ হয় ইহাই সোপান।’

এ কথা শুনিয়া মেরির চক্ষে জল আসিল,—আনন্দে সে লিওর মুখচুম্বন করিয়া বলিল, ‘লিও জগতে তুমি সর্বপ্রধান কবি হইবে।’

লিও হাসিয়া উঠিল, ‘আর কিছু না হউক মেরি, পিতার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।’

মেরি আজকাল স্বয়ং উত্তমর্গ, তাই এ কথার বড় লজ্জা পাইত। রাগ করিয়া বলিল, ‘এ কথা পুনর্বীর বলিলে তোমার কাছে আমি আর আসিব না।’

লিও হাসিল, মনে মনে কহিল, ‘তোমার পিতার নিকট আমার পিতা ঋণী; আমরা দুজনে তাঁহাদের সন্তান, তাই আমি জীবিত থাকিলে এ ঋণ তোমার নিকট পরিশোধ করিবই।’

লিওর আজকাল বড় পরিশ্রম বাড়িয়াছে। নূতন পুস্তক লিখিতেছিল, আজ সমস্ত দিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই। মেরি প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। লিওর শয়নকক্ষ, পাঠাগার, বসিবার ঘর প্রভৃতি স্বহস্তে সাজাইয়া গুছাইয়া দিতেছিল। দাসদাসী সত্ত্বেও এ কাজটি মেরি নিজে করিয়া যাইত।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, লিওর প্রতিবিম্ব তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। মেরি বহ্নক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিয়া বলিল, ‘লিও তুমি স্ত্রীলোক হইলে এতদিন ইংলন্ডের রানী হইতে।’

লিও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন?’

‘অত রূপ দেখিয়া রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তোমার মত কৃষ্ণ কুণ্ডিত কেশরাশি আমি আর্ট গ্যালারিতে কোন রাণীর দেখি নাই; এমন শুভ্র কোমল মুখশ্রী কোন্ সম্রাজ্ঞীর ছিল? গোলাপ পুষ্পের মত এমন কোমল মধুময় দেহশোভা স্বর্গে ভিনসেরও ছিল বলিয়া মনে হয় না।’

লিও খুব হাসিয়া উঠিল। কলেজে অধ্যয়নকালেও এমন কথা অনেকে কহিয়াছিল; বোধ হয় তাহাই মনে পড়িয়াছিল। হাসিয়া কহিল, 'রূপ যদি চুরি করা যাইত তা হইলে তুমি বোধ হয় এ রূপ চুরি করিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে ইংলন্ডের রানী হইয়া যাইতে।'

মেরি মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিল, 'তুমি স্ত্রীলোকের মত দুর্বল, তাহাদের মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর-তোমার রূপের সীমা নাই।'

এত রূপের নিকট মেরি আপনাকে বড় ক্ষুদ্র বিবেচনা করিত।

তিন

কোরেল গ্রামে প্রতি বৎসর অতি সমারোহের সহিত ঘোড়দৌড় হইত। আজি সেই উপলক্ষে প্রাপ্তস্থিত মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মেরি ধীরে ধীরে লিওর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। লিও তখনও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুস্তক লিখিতেছিল, তাই দেখিতে পাইল না। মেরি কহিল, 'আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।'

লিও ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, 'ইস—এত সাজিয়াছ কেন?'

মেরিও হাসিয়া ফেলিল; কহিল, 'সাজিয়াছি কেন শুনিবে?'

‘বল।’

আজ ঘোড়দৌড় হইবে। যে জয়ী হইবে, সে আজ আমাকেই ফুলের মালা দিবে।'

তবে ত তোমার আজ বড় সম্মান! তাই এত সাজসজ্জা!'

মেরি প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে কিছুক্ষণ লিওর মুখপানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পরম স্নেহে দুই হস্তে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, ‘শুধু তাই নয়। তুমি আমার কাছে থাকিবে। তোমার পাশে দাঁড়াইয়া পাছে নিতান্ত কুৎসিত দেখিতে হই, সেই ভয়ে এত সাজিয়াছি,–মণিমুক্তায় রূপ বাড়ে ত?’

সম্মুখস্থিত মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি পরিস্ফুট গোলাপ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, লিও তাহা দেখাইয়া বলিল, ‘ঐ দেখ।’

মেরি অতৃপ্ত নয়নে কিছুক্ষণ ঐ দুটি ছবির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বোধ হইল সেও বড় সুন্দরী। আজ তাহার প্রথম মনে হইল সৌন্দর্যের আশ্রয়ে দাঁড়াইলে কুৎসিত দেখিতে হয় না, বরং যাহা সৎ তাহাকে জড়াইয়া থাকিলে দোষটুকুও চাপা পড়িয়া যায়। আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মেরি ধীরে ধীরে কহিল, ‘আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক–তবু আমার কত শোভা!’

মেরি শিহরিয়া উঠিল। লিও তাহা অনুভব করিল, তাই তাহার মুখখানি আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ‘চাহিয়া দেখ,–তুমি আমার কলঙ্ক নহ–তুমি আমার শোভা! তুমি চাঁদের পূর্ণবিকশিত, উজ্জ্বল কৌমুদী!’

চক্ষু চাহিতে মেরির কিন্তু সাহস হইল না। কতক্ষণ হয়ত এইভাবে কাটিত, কিন্তু এই সময় অদূরস্থিত গির্জার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। মেরি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, ‘সময় হইয়াছে–চল!’

‘আমার যাওয়া একেবারে অসম্ভব।’

‘কেন?’

‘এই পুস্তক পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ করিয়া পাঠাইব বলিয়া চুক্তি করিয়াছি,—চুক্তিভঙ্গ হইলে বড় লজ্জায় পড়িব।’

মেরি রাগ করিয়া বলিল, ‘তা বলিয়া আমি তোমাকে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে কিছুতেই দিব না।’

লিওর মুখে লান ছায়া পড়িল; পিতৃস্বৰ্ণ স্মরণ করিয়া বলিল, ‘আমার অদৃষ্ট! কি করিব মেরি, পরিশ্রম করিতেই হইবে।’

মেরি তাহার মনের কথা বুঝিল, তাই আরো রাগ হইল। বলিল, ‘তোমার পুস্তক আমাকে বিক্রয় করিও—আমি দ্বিগুন মূল্য দিব।’

লিওর তাহাতে সন্দেহ ছিল না; হাসিয়া বলিল, ‘কিন্তু কি করিবে?’

মেরি নিজ গলদেশের বহুমূল্য মুক্তামালা দেখাইয়া বলিল, ‘এই মালা ছিন্ করিয়া ফেলিব,—যতগুলি মুক্তা, যে কয়খানি হীরক আছে সবগুলি দিয়া পুস্তকখানি বাঁধাইয়া সোনার কৌটায় করিয়া মাথার শিয়রে তুলিয়া রাখিব,—তারপর—তারপর—’

লিও বলিল, ‘তারপর কি?’

মেরি সলজ্জ হাস্যে রক্তিমাত মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া বলিল, ‘তারপর যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর তাহার কিরণগুলি তোমার নিদ্রিত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে, সেই দিন—’

‘সেই দিন কি?’

‘সেই দিন খুব উচ্চকণ্ঠে পাপিয়া ডাকিতে থাকিবে, তোমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙ্গিবে না, আমি তখন তোমার কানের কাছে বসিয়া’—মেরি হাসিয়া ফেলিল।

লিও বলিল,—‘আমার কানের কাছে বসিয়া পুস্তকটিতে যতগুলি কথা আছে, সবগুলি পড়িয়া ফেলিবে, না?’

মেরি মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘হুঁ।’

‘আমি তাহা হইলে জাগিয়া এমনি করিয়া তোমার মুখচুম্বন করিব।’

তাহার পর দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

ঘড়িতে দেড়টা বাজিয়াছে—লিও তাহা দেখিয়া বলিল, ‘ঢের হইয়াছে—এইবার যাও—।’

মেরি জাঁকিয়া বসিল; বলিল, ‘আমার শরীর খারাপ হইয়াছে—আজ যাইব না।’

‘তা কি হয়? কথা দিয়াছ, না যাইলে চলিবে কেন? কত লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।’

মেরি নিতান্ত অবাধ্যের মত কহিল, ‘চুক্তিভঙ্গ হইলে তোমার মত আমার বিশেষ লজ্জাবোধ হয় না—আমি যাইব না।’

‘ছিঃ—যাও। অবাধ্য হইও না।’

‘তবে তুমিও চল।’

‘ক্ষমতায় থাকিলে নিশ্চয় যাইতাম।’

‘ক্ষমতায় আছে—চল।’

‘ক্ষমতায় নাই—যাওয়া অসম্ভব।’

মেরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘তবে আমি আর এখানে আসিব না।’

লিও হাসিয়া বলিল, ‘আমি জানি তুমি নিশ্চয় আসিবে।’

মেরি রাগ করিয়া বলিল, ‘আমি না আসিলে তোমার হয়ত খাইবার অযত্ন হইবে। পোড়াপ্রাণে যে এটা সহ্য করতে পারি না, না হইলে নিশ্চয় দুই-এক দিন চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতাম।’

‘এ ক্ষমতাটুকু যদি নাই, তবে রাগ করিলে চলিবে কেন?’

কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে মেরির অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তাই ক্ষুণ্ণ অন্তঃকরণে গাড়িতে বসিয়া ভাবিল—সে ছেলেবেলার পড়িয়াছিল যে, উদরের উপর নাকি একদিন হাত-পাগুলো বড় চটিয়া গিয়াছিল—কিন্তু ফল বিশেষ তৃপ্তিজনক হয় নাই।

মেরি তাই রাগ করিতে পারিল না।

চার

দুইটার কিছু পূর্বে যখন মেরির প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল। সে সুন্দরী, সে যুবতী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী; মানবের যৌবনরাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে; এখানেও বহু মানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পরে যে তাহার শিরে জয়মাল্যটি প্রথম পরাইতে পারিবে জগতে সেই ভাগ্যবানের অদৃষ্ট আজ হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু। সওয়ারগণ রক্তবর্ণ পোশাকে সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে উৎসাহের বেগ ও চাঞ্চল্য কষ্টে সংযম করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন পর্বতও ভেদ করিতে সক্ষম,—মেরি উপস্থিত হইয়াছে, নির্দিষ্ট সময়ও আসিল,—পিস্তলের শব্দে সকলেই ব্যগ্র হইয়া দেখিল অশ্বশ্রেণী প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পর মেরির নিকট আসিয়া তাহারা অশ্ব সংযম করিল, নিমেষের মধ্যে এক একটি পুষ্পমাল্য হাতে লইয়া আবার ঘোড়া দৌড়াইয়া দিল।—মরিবার সময়টুকু পর্যন্ত তাহাদের নাই। প্রাণ তাহাদের নিকট আজি নিতান্ত তুচ্ছ—শুধু এক কথা মনে জাগিতেছে, কে সর্বপ্রথমে মেরির হস্তে মালা ফিরাইয়া দিতে পারিবে। প্রতি অঙ্গচালনায় শুধু ঐ এক ভাব;—মৃত্যু কিংবা সম্মান! মেরি মনে করিল, সে-ই আজি তাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু তাহার নিকট অগ্রে আসিবার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে। বালিকাসুলভ আনন্দে এবং যৌবনের চাপল্যে তাহার বুকখানি ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল।

ঘোড়া ছুটিয়াছে, সকলেই ব্যগ্রতার সহিত অপেক্ষা করিয়া আছে। কেহ কহিল, ডেভিড প্রথম হইবে; কেহ কহিল, চার্লস আগু হইয়াছে। বিদ্যুতের মত তাহারা অতীষ্ট স্থানে আসিতেছে। ঐ ডেভিড পিছাইয়া পড়িল, চার্লস অগ্রে আসিয়াছে—কেহ কহিল, এখনও কিছু বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা মুহূর্তমাত্র—পরক্ষণেই স্পষ্ট দেখা গেল, ডেভিড প্রভৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছে। চার্লস বিদ্যুতের মত ছুটিতেছে—তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই সে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য মেরির পদতলে নিক্ষেপ করিল। খুব কোলাহল হইল, অসংখ্য করতালিশব্দ বহু দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। চার্লস প্রথম হইয়াছে, মেরি সসম্মানে তাহার হস্ত গ্রহণ করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় রেস হইবে;—সওয়ারগণ স্ব স্ব অশ্বে স্থান গ্রহণ করিল। পিস্তলের শব্দে সকলেই কশাঘাত করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল—মেরির নিকট হইতে মাল্যগ্রহণ করিবার জন্য সকলেই ছুটিয়া আসিল, সেবার কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ চার্লস নীচে পড়িয়া গেল, পশ্চাতের অশ্ব তাহার পদদ্বয়ের উপর দিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া গেল—তাহারা নিকটে থাকিয়া তাহা দেখিল, তাহারা সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু চিৎকার শব্দ থামিবার পূর্বেই চার্লস লম্ফ দিয়া পুনর্বীর অশ্বারূঢ় হইল। পদদ্বয়ে দারুণ আঘাত

পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সে ক্ষেপও করিল না। অপরাপর অনেকেই চার্লসের জন্য শঙ্কিত হইল; দারুণ আঘাতবশতঃ যদি অশ্বপৃষ্ঠে স্থান না রাখিতে পারে! অজ্ঞাতসারে মেরিও এ সন্দেহ এবং শঙ্কা হৃদয়ে স্থানদান করিল,—প্রথম কারণ তাহার হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, পরদুঃখে শীঘ্রই আর্দ্র হইয়া যায়, দ্বিতীয় কারণটি তাহার বংশগত। বালিকাকাল হইতে সে বীরত্বের বড় পক্ষপাতী, তাহার পিতা-পিতামহ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন। এ সকল গল্প সে বাল্যকালে পিতার নিকট শুনিতে পাইত; অশ্বচালনা যুদ্ধের একটি অংশ,—ইহাতে কত দৃঢ়তা, সাহস এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। যাহা যুদ্ধের অংশ, তাহাই গৌরবের সামগ্রী। সম্মানের নিকট যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা প্রাণকেও নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে, আজ শুধু সম্মানলাভের জন্যই চার্লস এ আঘাত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে—হয়ত বা সে প্রাণ হারাইবে। মেরি শিহরিয়া উঠিল। এইমাত্র যাহার হস্তগ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছে, সে হয়ত প্রাণত্যাগ করিবে; এরূপ চিন্তা হৃদয়-প্রফুল্লকারী নহে, তাই অত্যন্ত আগ্রহ এবং ভীতির সহিত মেরি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল; চার্লসের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিল। তাহার পর বড় কোলাহল হইতে লাগিল; দূরবীন লাগাইয়া অনেকেই দেখিল চার্লস পুনর্বীর অগ্রে আসিতেছে; কিন্তু ইতিমধ্যে মেরি মনে মনে আপনাকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই চার্লসের সহিত এরূপ জড়িত করিয়া লইয়াছিল যে, তাহার এই দুঃসাহসিক কার্যের জন্য আপনাকে নিতান্ত গৌরবান্বিত এবং শ্লাঘ্য বলিয়া বোধ করিল। বাস্তবিক সেবারেও চার্লস জয়ী হইল,—আনন্দে মেরির সহসা বাক্য নিঃসৃত হইল না, পরে নিজের গলদেশ হইতে ঘড়ি ও চেন খুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, ‘তুমি এ গ্রামের রত্ন, তোমার মত সাহসী যুবা আর কেহ নাই।’ চার্লস স্মিতমুখে এ প্রশংসা গ্রহণ করিল।

সে রাত্রে মেরি সকলকেই নিমন্ত্রিত করিল, সন্ধ্যার পর তাহার বাটীতে খুব সমারোহে ভোজন ব্যাপার সমাধা হইতে চলিল; আহারে বসিয়া মেরি চার্লসের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, মৃদুকণ্ঠে কহিল, ‘তোমার জন্য বড় ভয় পাইয়াছিলাম।’

চার্লস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘কেন?’

‘বড় কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল,—তুমি ভিন্ন আর কেহ বোধ হয় অশ্বপৃষ্ঠে স্থান রাখিতে পারিত না।’

চার্লস বিনয়নম্রকণ্ঠে কহিল, ‘আমার আঘাত আরোগ্য হইয়াছে; আমার জন্য তুমি দুঃখিত হইয়াছিলে, এমন সৌভাগ্য পূর্বে কখন হয় নাই—এত আনন্দও কখনও অনুভব করি নাই—। তোমার করুণা পাইবার জন্য আমি একটা পা কাটিয়া দিতে পারিতাম; আঘাত ত তুচ্ছ কথা!’

সে রাত্রে অনেক শেরি, শ্যাম্পেনের শূন্যগর্ভ বোতল ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল; গভীর রাত্রি পর্যন্ত আপনার পাঠাগারের জানালায় বসিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে লিওপোল্ড বিকৃত জড়িত কণ্ঠের গীতধ্বনি শ্রবণ করিল; পিয়ানোর শব্দ বামবাম করিয়া আকাশে উঠিল; কর্কশ কণ্ঠের সহিত মধুর কণ্ঠও কয়েকবার মিশ্রিত হইল। জানালা বন্ধ করিয়া লিও শয্যাশ্রয় করিল,—আজ হৃদয়ে একটু যাতনা বোধ হইতেছিল।

পাঁচ

পরদিন মেরি লিওকে বলিল, ‘কাল আমাদের বাটীতে কেমন উৎসব হইয়া গেল, তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।’

লিও হস্তস্থিত কলম দোয়াতের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, ‘ভালই করিয়াছিলে—কিন্তু আমারও কাল রাত্রে কিছুই কাজ হয় নাই, কিছু ক্ষতি হইয়াছে।’

মেরি মুখপানে চাহিয়া বলিল, ‘কেন কাজ হয় নাই?’

লিও কলম তুলিয়া লইল, পুস্তকে মনঃসংযোগ করিবার উপক্রম করিয়া বলিল, ‘সে কথা তুলিয়া কাজ নাই, আমি বলিতে পারিব না।’

এরূপ কথা জীবনে মেরি এই প্রথম শুনিল। বিস্মিত হইয়া বলিল, ‘কেন?’

‘তা জানি না; বোধ হয় মন কিছু নীচ হইয়া পড়িয়াছে।’

তাহার পর মেরি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল কিন্তু লিও আর মুখ তুলিল না, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না।

মেরি যাইবার সময় বলিল, ‘যাইতেছি।’

‘যাও।’

যাইবার সময় তাহার বোধ হইল যেন সে লিওর মনের কথা কতক বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই—শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। যাহা হউক, ক্ষুদ্র পথটুকু সে বড় অন্যমনস্কভাবে অতিক্রম করিল। বাটীর ভিতের প্রবেশ করিবার সময় ভৃত্য একখানা টিকিট হাতে করিয়া কহিল, চার্লস বসিবার কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরি দ্রুত কুণ্ঠিত করিয়া বলিল, ‘কেন?’

‘তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই,—জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব কি?’

মেরি একটু ভাবিয়া বলিল, ‘থাক, আমি নিজেই যাইতেছি।’

চার্লসের বিশেষ কিছুই কাজ ছিল না। সে শুধু গত নিশির আমোদ-উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। মেরি কক্ষে প্রবেশ করিলে সে অতিশয় ভদ্রতার সহিত অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মেরি হাত ধরিয়া অতিথিকে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল,—কারণ পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু কথায় কথায় তাহা একটু অন্যরকমে দাঁড়াইতে চলিল।

মেরির কত ঐশ্বর্য, কত বিষয়-আশয়, কত মান-সম্মম! এই ত হইল প্রথম; তাহার পর মেরি কত উচ্চবংশীয়া, তাহার পিতা কত বড় বীর এবং সজ্জন ছিলেন—রাজদ্বারে তাঁহার যে পরিমাণ সম্মম ছিল সে পরিমাণের সম্মম অর্জন করিতে বিশেষ বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, রাজনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন, মেরির পিতা Captain নোলের তাহা কিছুমাত্র কম ছিল না; এক কথায় আজকাল সেরূপ আর মিলে না। কিন্তু শেষের কথাগুলি আরও উচ্চ অঙ্গের, মেরির তাহার খুব ভাল লাগিতেছিল;—সেটা অন্য কিছু নয়, শুধু তাহার নিজের রূপ এবং যৌবনের ব্যাখ্যা এবং পক্ষপাত সমালোচনা। পুরুষের মুখে এ কথাগুলো স্ত্রীলোকের সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিকর বোধ হয়, এ কথার কাছে আর কিছুই নয়। তাই কতক্ষণ দুইজনে নির্জন কক্ষে গল্প করিয়া অতিবাহিত করিল তাহা মেরি বুঝিতে পারিল না। ঘড়িতে যখন দুইটা বাজিল তখন চার্লস বিদায় হইল এবং যাইবার সময় সেই দিন সাক্ষ্যভোজনের নিমন্ত্রণও লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে, এই রূপ এবং ঐশ্বর্যের কাহিনীর তরঙ্গগুলো যখন অল্পে অল্পে শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিধ্বনিগুলো মেরির মস্তিষ্কের ভিতর ঠোকাঠুকি করিয়া ক্রমশঃ হীনবল হইয়া ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং যে অবশিষ্ট স্পন্দনটুকু নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাও যখন অন্য আর একটি অসীম সৌন্দর্যের পার্শ্বে কাতরভাবে ছুটিয়া পলাইবার প্রয়াস করিতে লাগিল, তখন তাহার বোধ হইল এই ঝোঁকের উপর আকস্মিক নিমন্ত্রণকার্যটা তেমন যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সন্ধ্যার পর সে আসিবে, দুইজনে একত্র আহার করিতে হইবে, হয়ত বা আর কেহই থাকিবে না, কত গল্প কত কথা বলিবার ও শুনিবার উপায় থাকিবে, কিন্তু মেরির তাহাতে আর তেমন মন উঠিল না। যদি আর কেহ জানিতে পারে? যদি তাহার ক্লেশ বোধ হয়? চঞ্চল হস্তে মেরি এক খণ্ড কাগজ লইয়া লিখিল, ‘তুমি সন্ধ্যার পর আসিও না; আমার শরীর মন্দ বোধ হইতেছে।’ কিন্তু এ পত্র চার্লসের নিকট পাঠাইতে লজ্জা বোধ হইল। অনেক চিন্তা করিয়া মেরি অবশেষে এইরূপ লিখিল, ‘যখন আসিবে তখন আর তিন-চারিজন বন্ধুকে আনিও। আনিতে পারিলে নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং সুখী হইব।’ ভৃত্য পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাত্রে চার্লস আরও দুই-তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে আনিল। আহারাди শেষ করিয়া সকলেই একবাক্যে মেরিকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়া বসিল। ইচ্ছা না থাকিলেও অতিথির অনুরোধ রাখিতে হইল; পিয়ানো-এ ঝঙ্কার দিয়া মেরির সুকণ্ঠ দুই-তিনটি সপ্তকের মধ্যে খেলা করিয়া ছুটিতে লাগিল, উৎসাহ ও আনন্দে চার্লস প্রভৃতি কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা আবেগের সহিত দুই-এক পদ সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ শেরি, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি ও রামের শূন্যগর্ভ বোতলগুলির সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইয়া চলিল, উৎসাহ, আবেগ, উচ্চস্বর ততই পরিপূর্ণভাবে নৈশ আকাশে ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। জানালার ভিতর দিয়া এ শব্দ লিওর পাঠাগারে যে একদম প্রবেশ করে নাই তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক আজ লিও জানালাগুলো একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শব্দ-সাড়াগুলো সেখানে তেমন গোলযোগ করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে গাহিতে গাহিতে মেরির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, পার্শ্বেও চার্লস কিংবা আর কেহ শেরির গ্লাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমাগত শেরি গ্লাসের মুখচুম্বন করিয়া মেরির গলাটা নিতান্ত সরস এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিল। উৎসাহের সহিত গভীর রাত্রি পর্যন্ত পিয়ানোর ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল।

শেষ হইলে, শয্যায়া শয়ন করিয়া সেদিনের মত আজ আর নিদ্রা আসিল না; মেরি অনেক কথা ভাবিল। পুরুষের দল তাহার বড় প্রশংসা করিয়াছে—কেমন করিয়া তাহার শুভ্র পুষ্পকোরকতুল্য অঙ্গুলি কি-বোর্ডের উপর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া যাইতেছিল এবং অঙ্গুলি সংলগ্ন বৃহৎ হীরক-অঙ্গুরীয় মধ্যে মধ্যে ঝকঝক করিয়া এক শোভা দশগুণ করিয়াছিল; কিন্তু সহসা মনে পড়িল হয়ত আর একজনের আরও শুভ্র, আরও সুন্দর, কিন্তু ক্লান্ত এবং অবসন্ন অঙ্গুলি দুইটি এখনও নিঃশব্দে কাগজের উপর দিয়া ধীরে ধীরে লিখিয়া চলিয়াছে। সে হয়ত সমস্ত শুনিয়াছে, হয়ত বা ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবিধানের উপায় কৈ? মধু থাকিলে মৌমাছি আসিবেই, ধন থাকিলে তাহার চতুষ্পার্শ্বে লোকসমূহ জড় হইবেই, নূতন সম্বন্ধের বন্ধন যৌবনের অঙ্গ জড়াইয়া উঠিবার স্বতঃ প্রয়াস

করিবেই—ইচ্ছা থাকিলেও এ বাঁধন নিজ হস্তে খুলিয়া ফেলা যায় না। মেরি কাতরভাবে উদ্ধারের কামনা এবং প্রার্থনা করিতে করিতে সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সে লিওর কাছে গিয়া বসিল, লিও লিখিতেছে, কৈ একবারও চাহিয়া দেখিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া মেরি কথা খুঁজিয়া পাইল না—তারপর সাহসে ভর করিয়া বলিল, ‘তোমার আর কত বাকি আছে?’

‘অনেক।’

‘আজ দু-তিনদিন ধরিয়া কি লিখিলে? আমাকে শুনাইবে না?’

এই সময়ে অনবধানতাবশতঃ কলমের মুখে অনেকখানি কালি উঠিয়াছিল; টপ করিয়া একটা বড় রকমের ফোঁটা শুভ্র কাগজের উপর পতিত হইল। লিও খাতাখানা ঈষৎ সরাইয়া কলমের মুখটা মুছিতে মুছিতে বলিল, ‘মেরি, তোমার মুখ দিয়া বড় তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে; এ গন্ধ আমার সহ্য হয় না—সরিয়া বস। অত কাছে বসিয়া থাকিলে আমার সমস্ত ভুল হইয়া যাইবে।’

একদণ্ডে মেরির চক্ষু দুটি চকচক করিয়া উঠিল; বলিল, ‘আমি তীব্র সুরা পান করি নাই।’

‘হইতে পারে। কিন্তু আমার নিকট ও গন্ধ বড় উগ্র বোধ হইতেছে। তুমি হয় সরিয়া বস, না হয় গৃহে যাও।’

মেরি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চিরকাল আদর ও যত্নের মধ্যে লালিত পালিত। এরূপ তাচ্ছিল্যের কথা শুনা তাহার অভ্যাস নহে। বড় অপমান বোধ হইল। তাহার সমস্ত হৃদয় আত্মাভিमानে পরিপূর্ণ, তাই এ ক্ষুদ্র যুবার কোমল অথচ রীতিমত দৃঢ় ও নির্ভীক সত্য কথা তাহার সমস্ত শরীরে অকস্মাৎ খর বিষের জ্বালা জ্বলাইয়া দিল। দাঁড়াইবার সময়

সে ভাবিয়াছিল, খুব দুটো চড়া কথা শুনাইয়া দিবে; মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি শব্দগুলো আরোপ করিয়া, তাহার বৃকে ছুরির মত বিদ্ধ করিয়া দিবে—তারপর যথারীতি খুব একচোট কলহ করিয়া চিরদিনের মত বিচ্ছেদ করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার শব্দশাস্ত্রের অভিধানটা একেবারে কোথায় হারাইয়া গেল। ঙ্গ কুণ্ঠিত করিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দন্তে অধর দংশন করিল কিন্তু কথা বাহির হইল না।

সম্মুখের দর্পণে সে চিত্র লিও দেখিতে পাইল। কাছে আসিয়া মেরির উন্নত গ্রীবার এক পার্শ্বে হাত রাখিয়া বলিল, ‘অপমান বোধ হইয়াছে?’

মেরির আত্মাভিমান এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, ‘তুমি নীচ এবং ঈর্ষাপরবশ, তাই অপমান করিলে!’

লিও ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কহিল, ‘মেরি, জগতের মধ্যে ঐ দুটি কথা আমার সহ্য হয় না। অমন কথা আর মুখে আনিও না। তুমি অধঃপথে যাইতেছ, তাই সাবধান করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরিবর্তে ওরূপ মর্মান্তিক কথা শুনিবার বাসনা রাখি না।’

মেরি আরও দ্রুত হইল। বলিল, ‘অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?’

‘আমার তাই মনে হয়। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, বিশেষত তুমি একান্তে অত রাত্রি পর্যন্ত যে আমোদ-প্রমোদ করিবে আমার সেটা ভাল বোধ হয় না। লোকেই বা কি বলিবে?’

আবার লোকের কথা! মেরি অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, ‘লোকে কিছুই মনে করে না। তুমি দরিদ্র কিন্তু আমার ধন ঐশ্বর্য আছে, তোমার মত অনবরত পরিশ্রম করিয়া আমার খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে না, তোমার মত নির্জন গৃহে বসিয়া জনসমাজের নিকট অপরিচিত থাকিলেই বরং লোকে মন্দ বলিবে।’ তাহার পর একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, ‘লিও, আপনার ভাগ্য দিয়া আমার ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিও না—পিতা

আমার জন্য অভিশাপ এবং মর্মপীড়া রাখিয়া যান নাই—যাহা সুখের,যাহা বাঞ্ছিত, সমস্তই যথেষ্ট দিয়া গিয়াছেন। যাহার এত আছে তাহার পক্ষে দু-দশজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিলে কেহই দুঃখে না।’

এত কথা মেরি কহিতে জানে, লিও তাহা জানিত না; এত স্নেহ, এত করুণা যে এত তীব্র বিষ ঢালিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য ওলটপালট করিয়া দিতে পারে, সে ধারণা লিও করিতে পারে নাই—তাই নিতান্ত নিজীব অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। কোন উত্তর বা কোনরূপ প্রতিবাদ খুঁজিয়া পাইল না। রাগের মাথায় মেরি চলিয়া গেল, তাহা সে দেখিল কিন্তু ফিরাইতে পারিল না, ইচ্ছাও বড় বেশি ছিল না, কিন্তু দুটো কথা বলিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত।

আপনার কক্ষে পৌঁছিয়া মেরি, একখণ্ড রুমালে মুখ আবৃত করিয়া একটা সোফার উপর বসিয়া পড়িল—সমস্ত শরীরে অগ্নির উত্তাপ বাহির হইতেছে।

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, চার্লস অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরি মুখ তুলিয়া তাহার পানে তীব্র কটাক্ষ করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, ‘তাড়াইয়া দাও।’

ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। চার্লসের নিকটে গিয়া কহিল, ‘শরীর খারাপ, এখন দেখা হইবে না।’

চার্লস উৎকণ্ঠিতভাবে নানারূপ প্রশ্ন করিল। কখন শরীর খারাপ হইয়াছে, কেমন করিয়া হইল, কতক্ষণে সারিবে—ইত্যাদি অনেক কথা এক নিঃশ্বাসে কহিয়া গেল। উত্তর পাইল না। সদ্য তিরস্কৃত হইয়া ভৃত্য মহাশয় কিছু চটিয়াছিলেন; কিন্তু তিরস্কার যে তাহাকে করা হয় নাই, সে কথা সে বুঝিল না। বলিল, ‘আমি অত জানি না।’

হতাশ হইয়া চার্লস একটা ফুলের তোড়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, ‘আমার নাম করিয়া এইটা দিও।’

ভূত্য পার্শ্বের টেবিলে তাহা রাখিয়া দিয়া বলিল, ‘তিনি নীচে আসিলে দিব।’

হয়

প্রায় এক মাস অতীত হইল কেহই কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিল না। মেরি মনে করে যে, তাহার বাল্যসখাটি তাহার শরীরের ও মনের চতুষ্পার্শ্বে যে মমতার আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছিল, তাহা অল্পে অল্পে সে কাটিয়া ফেলিয়াছে; আর তাহার উপর কোন স্নেহ নাই, মায়া নাই—এক বিন্দু সম্বন্ধ পর্যন্ত নাই। এই এক মাসের মধ্যে সে এই কথাগুলি নিশিদিন ধরিয়া মনে মনে তোলাপাড়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু যত অধিক সে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছে, তত বেশি সে আপনাকে প্রতারণিত করিয়াছে। নিজের হৃদয়ের তলায় সে এক দিনও প্রবেশ করে নাই, করিলে দেখিতে পাইত যে, সেখানে শুধু লিও আর নিজে অষ্টপ্রহর মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে। প্রেমমালাপ করিতেছে না—কলহ করিতেছে। উঠিতে বসিতে সে সর্বদাই চিন্তা করে, কি করিলে এ কলহটা আরও পাকাইয়া তুলিতে পারা যায়, কিরূপ নিত্য নব উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে লিওর বিরক্তি আরও একটু সজীব করিয়া তুলিতে পারা যায়। কিরূপ আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিলে তাহাকে আরও একটু ম্রিয়মাণ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে আরও দুই-একবার ভোজন উৎসবাদি সমাধা হইয়াছে, ব্যয়বাহুল্য এবং আয়োজনাদির পারিপাট্য দেখিয়া গ্রামের লোক কত সুখ্যাতি করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার মন নাই। মানস-চক্ষে সে শুধু দেখিতে চাহে, এ-সকল কাহিনী শুনিয়া লিওর মুখ কিরূপ বিশুদ্ধ এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, কর্ণে শুনিতে চাহে, লিও কিরূপ ফুলিয়া ফুলিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এত অর্থব্যয় বুঝি তাহা হইলে সার্থক হয়। অর্থব্যয়ের কারণ ঐ লিও এবং উদ্দেশ্য তাহার যাতনা বৃদ্ধি করা;—কিন্তু সফলতার কথা কেহ বলে না। এ কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় না—কিন্তু এমন কি কেহ নাই, এমন কি কোন সর্বদর্শী অন্তর্যামী পদার্থ নাই, যাহা এ কথা

বলিয়া যাইতে পারে? মেরি অন্যমনস্কভাবে এই সব ভাবে। কিন্তু যখন মনে হয়, লিও তাহার পুষ্পের মত শুভ্র শান্ত দেহটি লইয়া হৃদয়ের মধ্যে জগতের শক্তি এক করিয়া পর্বতের মত দৃঢ় হইয়া আছে, এত সমারোহ, হট্টগোল তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত খাইয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে, ভিতরে একটিবারও প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; হয়ত বা সে-হৃদয়ে জ্বালার পরিবর্তে অবহেলা ও ঘৃণার স্থান হইয়াছে, তখন মেরির সমস্ত শিরা, অস্থি, মজ্জা-যাহা কিছু আছে সমস্ত এক সাথে ঝামঝাম করিয়া সুরে-বেসুরে নিতান্ত একটা অবসন্ন হতাশ ছবি চক্ষের উপর দাঁড় করাইয়া দেয়।

উৎসবরাত্রে যখন সকলে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাটীময় সাড়াশব্দে পূর্ণিত, শিখরে শিখরে উৎসবের সহস্র দীপ দৈত্যরাজার প্রমোদভবনের মত শোভা পাইতেছে—হয়ত সে সময়ে মেরি একটু নির্জনে বসিয়া একটা অপরূপ বিষাদচিত্র মনে মনে আঁকিতেছে। ভাবিতেছে, লিও হয়ত এতক্ষণে তাহার নৈশ কার্য শেষ করিয়া শীতল বায়ুর জন্য একটিবার মাত্র জানালা খুলিয়াছে; উৎসবের দীপামালা চক্ষে পড়িয়াছে—কিন্তু নিমেষের জন্য! নিতান্ত অবজ্ঞাভরে জানালা রুদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই সে নিতান্ত নিশ্চিত-মনে আপনার স্নিগ্ধ শয্যাটলটি আশ্রয় করিয়া শুইয়া আছে,—নিদ্রাদেবী পদুহস্তে তাহার পদ্যের মত দুটি চক্ষের উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে নিদ্রিত করিতেছেন। মেরি ছটফট করিয়া উঠিয়া পড়িল,—ভাবিল, সে নিজে? নিজের কথা নিজেই বুঝে না—মনে হয়, এত উৎসব-সমারোহ মিথ্যা পণ্ড্রম মাত্র! লিওর গ্রাহ্যের মধ্যেও আসে না।

জ্বালার উপর জ্বালা, মেরি ধনবতী কিন্তু লিও দরিদ্র, তাহার সহায়-সম্পদ আছে, লিওর কিছুই নাই, জনসাধারণ তাহাকে কত খাতির-যত্ন করে, লিওকে কেহ চিনে না, তবুও সে এত উচ্চে বসিয়া আছে যে, মেরি তাহার যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়াও তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছে না। তাহার রূপ যৌবন ঐশ্বর্যের পদতলে কতলোক নিত্য আসিয়া মাথা নত করিতেছে, স্বেচ্ছায় অযাচিত আপনাকে বিক্রয় করিবার জন্য তাহার পানে ঈষৎ সঙ্কেতের অপেক্ষামাত্র করিয়া দীন নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দারিদ্র্যপীড়িত, পরিশ্রমক্লিষ্ট, অসহায় অলৌকিক জীবটি একবার ফিরিয়াও দেখে না। সে

ধরিতে চাহে না, ধরা দিতেও চাহে না। রাগের মাথায় মেরি আকাশের গায়ে থুথু ফেলিত।
লিওর স্থান বড় উচ্ছে, সেখানে এ-সব পৌঁছিত না, শুধু মেরির মুখে-চোখেই তাহা ফিরিয়া
আসিত। দ্বিগুণ জ্বালায় সে আপনি জ্বলিয়া মরিত।

সাত

নিজের জন্মতিথি উপলক্ষে বাটীতে আজ মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতেছে,
প্রতি বৎসরই ইহা হইত, কিন্তু এবার জাঁকজমক কিছু বেশি। সমস্ত বাটীময় ফল, ফুল ও
রংদার পাতায় সাজান হইতেছে, সহস্র দীপ নানাবর্ণ বিচিত্র কাচপাত্রের ভিতরে সজ্জিত
হইয়া শুধু রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। গ্রামের সমস্ত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষগণ নিমন্ত্রিত
হইয়াছেন; এই সময় লন্ডন নগরে কে একজন প্রসিদ্ধ জাদুকর আসিয়াছিল, বহু অর্থ ব্যয়
করিয়া সে-রাত্রের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বাজিকরের বাজি দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই আনেকে ধীরে ধীরে জমা
হইতেছে। যাহার শরীর অসুস্থ সেও রীতিমত গরম কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া সন্ধ্যার
মধ্যেই উপযুক্ত স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। কথা ছিল সাতটার গাড়িতে বাজিকর
আসিবে এবং অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার বিদ্যা হস্তকৌশল ইত্যাদি পরিদর্শন করাইবে;
তাহার পর দশটার সময় ভোজনাদি হইবে। সাড়ে-সাতটার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া
ছিল, কিন্তু সাতটার সময় একটা অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। বাজিকরের পরিবর্তে একখানা
টেলিগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল। ‘জাদুকর হঠাৎ বড় পীড়িত হইয়াছে—আসিতে পারিবে
না।’ সঙ্গে সঙ্গে মেরির মাথাটা ঘুরিয়া গেল। এখন উপায়? দক্ষিণ হস্তে চার্লসের হস্তে
কাগজখানা দিয়া বলিল, ‘যাহা হয় কর। কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, সহসা
পীড়িত হইয়া শয্যা আশ্রয় করিয়াছি।’

টেলিগ্রাফ পড়িয়া চার্লসও বিষম অভিভূত হইল; সেও কহিল, ‘উপায়? সাতটা হইতে
দশটা পর্যন্ত কাটে কিরূপে?’

আপাততঃ এ কথা চাপা রহিল। ক্রমশঃ লোকে হল্ পূর্ণ হইয়া গেল। আগ্রহ এবং উৎকর্ষা সকলের মুখে; ক্রমে যত সময় যাইতে লাগিল, তত সকলে ব্যস্ত হইতে লাগিল। যাহারা কিছু অসুস্থ ছিল, তাহারা গৃহে প্রত্যাগমনের উপায় খুঁজিতে লাগিল। সর্বত্রই একটা অস্ফুট চাপা কলরব হইতে লাগিল, ভাবগতিক দেখিয়া মেরির নিজের কেশ উৎপাটন করিবার ইচ্ছা হইল। ক্রমশঃ কথাটা জানাজানি হইল—তখন হতাশ হইয়া কেহ বা সংগীতের কথা উত্থাপন করিল, কোন বৃদ্ধ বা তাহার সঙ্গিনীকে হুইষ্ট টেবিলের দিকে টানিয়া লইয়া গেল, কোন যুবক তাহার বন্ধুর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বিলিয়ার্ড হলের দিকে চলিল,—এইরূপে সাতটা হইতে দশটা পর্যন্ত কেমন করিয়া কাটান যাইতে পারে তাহা সবাই ভাবিতে বসিল। সকলকে অন্য কোন উপায়ে নিযুক্ত রাখিবার কোনরূপ আয়োজন করিয়া রাখা হয় নাই বলিয়া মেরি মৃদুকণ্ঠে চার্লসকে অনুযোগ করিল, কিন্তু উপায় কেহই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইল না।

আপাদমস্তক আলস্তরে আবৃত করিয়া আজ লিওপোল্ড আসিয়াছিল, হলের এক কোণে একটা সোফায় বসিয়া নিকটস্থ একজন যুবতীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ‘জাদুকর আসিল না কেন?’

যুবতী কহিল, ‘তাহার সহসা পীড়া হইয়াছে।’

‘তাহা হইলে?’

‘তাহা হইলে আর কি? দশটা পর্যন্ত যাহার যাহা খুশি করুক। মেরির অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে—সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে।’

লিও একটু ভাবিয়া বলিল, ‘আমি গাহিতে জানি। বোধ হয় নিতান্ত মন্দ শুনাইবে না,—কি বল?’

রমণীটি অতিশয় সংগীতপ্রিয়। সে একেবারে লিওর হাত ধরিয়া পিয়ানোর নিকট টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দিল। স্বহস্তে ডালা খুলিয়া দিয়া বলিল, ‘বাজাও।’

পিয়ানো ডাকিয়া উঠিল—‘ঝম ঝম ঝম!’

অনেকেই এখনো এদিকে চাহে নাই, পিয়ানোর শব্দে তাহারা ফিরিয়া চাহিল। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তখন মর্তের পিয়ানো স্বর্গের সংগীত বলিতেছিল। যাহারা বুঝিত, তাহারা বুঝিল। এরূপ অলৌকিক ক্ষিপ্রহস্ত, এরূপ পারদর্শী অসামান্য শিক্ষিত অঙ্গুলি বোধ হয় ইতিপূর্বে কখনও এ পিয়ানো স্পর্শ করে নাই। পার্শ্বের কামরায় যাহারা তাস লইয়া বসিয়াছিল তাহারা ক্রীড়া স্থগিত করিল; বিলিয়ার্ড হলের দিকে যাহারা পদচালনা করিয়াছিল, তাহারা আপাততঃ দাঁড়াইয়া পড়িল। সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘কে?’

কেহই লিওকে ভাল করিয়া দেখে নাই, তাই কেহই চিনিতে পারিল না। যে চিনিতে সে কথা কহিল না। তাহার পর, পিয়ানো যাহা অস্ফুট বলিতেছিল, কণ্ঠ তাহা স্পষ্টতম করিল। সে কণ্ঠের তুলনা হয় না। অশীতিপর বৃদ্ধও মনে করিল, তাহার জীবনে এরূপ কণ্ঠস্বর শুনে নাই। ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা মনে করিল জগতের শেষ দিনটিতে বুঝি দেবতাগণ এইরূপ সংগীত করিবেন। লহরে লহরে সে স্বর কক্ষ ভরিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল; ঘূর্ণবায়ু যেমন রাস্তার ধূলা, কুটা, তৃণ, কঙ্কর সমস্তই একসাথে ঘুরাইয়া লইয়া আকাশে উঠে, এ স্বরও তেমনি বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের মন একসাথে উপরে উড়াইয়া চলিল। এরূপ মুগ্ধ করিতে জাদুকর বোধ হয় পারিত না। নিস্পন্দ নীরব—কাহারো মুখে কথা নাই, অনেকের শরীরে চৈতন্যের লক্ষণটুকু পর্যন্ত নাই। ঠিক কোন্ সময়ে গীতটি শেষ হইল, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহার পর পিয়ানো যখন ঝম ঝম ঝম করিয়া তাহার শেষ ঝঙ্কারটুকু মুগ্ধ আকাশের তরঙ্গশ্রেণীর শেষ গতিটুকু বিতরণ করিয়া স্তব্ধ হইল, তখন সেই আহুত জনমণ্ডলী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে একেবারে পিয়ানোর চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে?’ কেহ উত্তর দিতে পারিল না।

লিও নিজের মুখ নিচু করিয়া রাখিয়াছিল। আবার পিয়ানো ঝম ঝম করিয়া উঠিল, নিমেষে মুগ্ধ, বিস্মিত জনমণ্ডলী সরিয়া গেল,—যে যেখানে পাইল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল, শুনিল নিজীব পিয়ানো সজীব হইয়া কত কি কথা বলিয়া যাইতেছে, পুনর্বীর কণ্ঠস্বর তাহা স্পষ্টতর করিয়া দিল। লিও বিরহের গান গাহিতেছিল;—কোন সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া পরিত্যক্ত রাজকন্যা তাহার প্রণয়ীর জন্য সমুদ্রকে ডাকিয়া বলিতেছে, ‘ওগো সমুদ্র আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দাও;—ফিরাইয়া দাও;—কোন অতলগর্ভে তাহাকে নিমজ্জিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে; হায়, দয়া করিয়া ফিরাইয়া দাও, না হইলে আমাকেও তোমার একটি তরঙ্গ পাঠাইয়া টানিয়া লও। এ দুঃসহ জীবনের ভার আর বহিতে পারি না।’ গানের ভাবটা এইরূপ। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহার কিভাবে কাটিতেছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু মেরির কথা বলি নাই। সে এতক্ষণ একটা কোচের বাজুতে মাথা রাখিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—বুঝি তাহার সমস্ত হৃদয়খানা সঙ্গীত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে;—সমুদ্র কি, তাহা সে জানে না, শুধু আকুল মর্মভেদী ক্রন্দনে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—সে আমার হারাইয়া গিয়াছে—ওগো, ফিরাইয়া দাও!—ফিরাইয়া দাও!

প্রবল জ্বরে যেমন রোগীর কিছুতেই পিপাসার শান্তি হয় না, তেমনি এই নিমগ্নিত ব্যক্তিবর্গের সংগীতের তৃষ্ণা কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। একটির পর একটি করিয়া কতগুলি সংগীত হইল!

দশটা বাজিয়া গিয়াছে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া লিও পিয়ানোর ডালা বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তখন সকলে চিনিল, লিও! মেরি যখন চিনিতে পারিল, তখন সে টলিতে টলিতে একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য তাহার চৈতন্য রহিল না। সে শুধু ক্ষণকালের জন্য। তাহার পর মেরি উঠিয়া বসিল, আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইল; চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল সকলে একত্রিত হইয়াছে কিন্তু লিও নাই। সেই কথাই সকলে বলাবলি করিতেছিল, মেরি

আসিবামাত্র সকলেই এ প্রশ্ন করিল;—মেরি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ‘জানি না।’ সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই জানে না। অবশেষে দ্বারবান সংবাদ দিল—লিও চলিয়া গিয়াছে।

কেহই কারণ বুঝিল না, কিন্তু কথাটা সকলের মনেই খট করিয়া বাজিল। লজ্জায় ও অভিমানে মেরি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া রক্তাক্ত করিল।

সে অনিমন্ত্রিত অযাচিত আসিয়াছিল। মেরির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বৎসরই আসিত, আজও তাহাই আসিয়াছিল; নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করে নাই। আজিকার দিনে না আসিলে এত আনন্দ কতকটা নিরানন্দে পরিণত হইত। মেরির মান বজায় রাখিয়া সকলকে নিরতিশয় সুখী করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে। দুটো ধন্যবাদ, দুটো কৃতজ্ঞতার কথা, কিছুই অবকাশ দেয় নাই; নীরবে গৃহকত্রীকে সহস্র অপরাধী করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই মেরি গুপ্ত অবমাননায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সংগীতশাস্ত্রের প্রথম অঙ্কের সহিতও যে লিওর পরিচয় আছে—এতদিনের ঘনিষ্ঠ আলাপেও মেরি তাহা জানিতে পারে নাই, তাই তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল না। যখন চিনিল তখন তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল,—তাহার পর এই নীরব প্রচ্ছন্ন অবমাননা। যাতনার তাড়নায় সে-রাত্রের জন্য মেরি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না।

আট

আরও তিন দিন নিঃশব্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। এইবার, এতদিন পরে লিওর চক্ষে খুব বড় দু’ ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল। আজ মাসাধিক কাল হইল মেরি অল্পে অল্পে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সামর্থ্যানুযায়ী অবহেলা তাচ্ছিল্য করিতে ত্রুটি করে নাই কিন্তু এত দিন পরে অবমাননা করিয়াছে। সে যে আত্মসম্মান তুচ্ছ করিয়া অনাহূত অতিথি হইতে গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে অবজ্ঞার মৌন জ্বালাটুকু লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এইটাই তাহাকে অধিক বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিন অতিবাহিত হইল, সে

একবার আসিল না, একবার ডাকিল না, আর চোখের জলের অপরাধ কি? কিন্তু শুধু কি তাই? লিওর অন্তরের ভিতর হইতে একটা ধিক্কার উঠিয়াছে। পরে দুঃখ দিলে চোখে জল আসে, কিন্তু সেজন্য আপনাকে কেহ ধিক্কার দেয় না, বরং নিজেকে একটু উচ্চ স্থানে দাঁড় করাইয়া একটু সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করে। অদৃষ্টকে দোষ দিয়া কর্মফলের নিন্দা করিয়া, পরের মন্দ চরিত্রকে গালি পাড়িয়া অনেকটা শান্ত হওয়া যায়; কিন্তু যাহার আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়—তাহার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই, তাহার সান্ত্বনা এ জগতে আছে কিনা বলিতে পারি না। লিওর একফোঁটা অশ্রু মেরির জন্য পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষ ফোঁটাটি যখন চক্ষু ছাপাইয়া গগু বাহিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িল, তখন তাহার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া যাইবার মত হইল। এ অশ্রু তাহার নিজের জন্য পড়িয়াছে।—সকলের এমন দুর্ভাগ্য ঘটে না, ঘটিলেও হয়ত বুঝিতে পারে না, কিন্তু যদি কখন কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে লিওর মত নিশ্চয়ই যুক্তকরে উর্ধ্বমুখে কহে, ‘ভগবান, এমন অশ্রুপাত কাহাকেও করাইও না।’

এক মাস হইতে লিওর অন্তরে সুখ নাই, কিন্তু সম্মান ছিল, আত্মগৌরব তাহাকে পর্বতের মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ সে প্রথম দেখিয়াছে যে, তাহারই আত্মগৌরব তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, আত্মা বিদ্রোহী হইয়াছে, মন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। মেরিকে সে ভালবাসিত, কারণ মেরিও তাহাকে ভালবাসিত; এটা বেশ কথা; তার পর সে রাগ করিল, কথা না শুনিয়া অবাধ্য হইয়া পড়িল, আর তাহার ভালবাসা নাই—লিও মনে স্থির করিল সেও আর বাসিবে না, তবে একটা পদার্থকে এতদিন পরে বিনাশ করিতে হইলে ক্লেশ বোধ হয়, লিওরও ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করিল যে, স্ত্রীচরিত্র সহজে বুঝা যায় না, মেরিকেও সে এজন্য বুঝিতে না পারিয়া ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল, যাহা হউক এখন সংশোধন করিলেই হইবে।

সে আপনাকে শোধরাইয়া লইল, তবে মধ্যে মধ্যে দুঃখ হয়, মধ্যে মধ্যে হাসিও পায়, এমন হইয়াই থাকে, এজন্য কোন ক্ষতি নাই। সে আপনাকে সংযত করিয়া, জগতের যাবতীয় দুর্ভাবনা, দুঃখ, ক্লেশ দূর করিয়া দিয়া, পরম আনন্দে সমস্ত অন্তরাত্মা এই

পুস্তকখানির উপর ন্যস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে ‘ইভা’র চরিত্র গড়িতেছিল। লিখিয়া শেষ করিতে পারিতেছিল না—গুণের কথা লিখিতে বুঝি স্বর্গও ফুরাইয়া যাইবে, রূপের মাধুরী বর্ণনা করিতে বুঝি স্বয়ং সজীব প্রকৃতিদেবীকে টানিয়া আনিয়া ইভার চতুর্দিকে জড়াইয়া দিতে হইবে; তাহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি আঁকিবার আনন্দে লিওর আহা-নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল, এই এক মাস ধরিয়া দারুণ পরিশ্রমেও এক তিল ক্লান্তি বোধ করে নাই, তথাপি এ চিত্র শেষ হইতেছে না, মনে হয় যদি অব্যক্ত অজানিত দুটো কথা কেহ বলিয়া দিতে পারিত,— সে দেবী-হৃদয়ের গোটা দুই গুপ্ত কথা কিছুতেই বুদ্ধিতে আসিতেছিল না, তাহা যদি পরিস্কৃত হইত তাহা হইলে, এ স্বর্গচিত্র কোন স্বর্গীয় দেবীর হস্তে পরমানন্দে সমর্পণ করিয়া লিও তাহার এ জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা কাগজ কলম যাহা কিছু আছে সমস্তই উৎসর্গ করিয়া নিতান্ত নিশ্চিত মনে বাকি জীবনটা চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিত। আজ প্রাতঃকাল হইতে লিও এই লিখিত চিত্রখানি ভাল করিয়া দেখিতেছিল; সহসা মনে হইল, লোকটিকে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে, যেন এ দেবী-প্রতিমার সহিত কখন কোন স্বপ্নরাজ্যে দেখাশুনা হইয়াছিল, একটু বোধ হয় পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সে আর নাই, দেখাশুনা হইলে হয়ত বা চিনিতে পারা যায় কিন্তু মুখখানি মনে পড়িতেছে না। প্রাতঃকাল হইতেই সে এ কথা ভাবিতেছিল।

এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, বাগান ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে—লিও তাহার মধ্যে বসিয়া। দুই ফোঁটা অশ্রুর শেষ বিন্দুটি এখনও গণ্ড ছাড়ায় নাই—বুকের উপর হয়ত এইবারে পড়িবে। লিও ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, ‘ভগবান! এত পরিশ্রম করিয়া কি শেষে মেরির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি? দিবানিশির এই গভীর একান্ত চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, আনন্দ, আশা, ভরসা কি সব মেরির পদতলে লুটাইয়া দিয়াছি? কি করিতে কি করিয়াছি, ভগবান! লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অবমানিত—আমাকে কি শেষে মেরির চিরদাস করিয়া দিয়াছ? হৃদয়, মন, চিন্তাশক্তি, কল্পনা—সমস্ত অযাচিত তাহাকে দিয়া আমি কি শূন্যগর্ভ জড় পুতুলের মত হইয়াছি? সে চাহে না, আমি চাই। সে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, আমি ধূলার মত পদতল জড়াইয়া আছি।’ ছুটিয়া আসিয়া লিও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

নয়

এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয় নাই, মেরি চার্লসকে হঠাৎ বলিল, ‘তুমি আমার একটা উপকার করিতে পারিবে?’ আজ মেরির চক্ষু দুটা কতকটা উন্মাদের মত চকচক করিতেছে।

চার্লস কহিল, ‘কি রকম উপকার?’

মেরি একটু থামিয়া বলিল, ‘তবে শোন, তোমাকে বুঝাইয়া বলি;—আমার বকের মাঝখানে একটা ছোট্ট, অতি ক্ষুদ্র কাঁটা ফুটিয়াছে। বাহির হইতে দেখা যায় না, বড় ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বদা খচখচ করিতেছে—এক বিন্দুও সুখ পাই না; তুমি তুলিয়া দিতে পারিবে?’

চার্লস ভাবিল কি রকম! বলিল, ‘কেমন করিয়া কবে ফুটিল?’

মেরি মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘তাও শুনিবে? শোন, কিন্তু বোধ হয় বুঝিতে পারিবে না। ছেলেবেলায় একটা গোলাপ ফুল লইয়া খেলা করিতাম, তাতে একটা কাঁটা ছিল—দেখিতে পাই নাই। তার পর মনে কোনদিন বুঝি ঘুমের ঘোরে বকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম—কাঁটাটি ফুটিয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে—এখন কাঁটাটি বাহির করিয়া ফেলিতে চাই, —তুমি পারিবে?’

চার্লস কিছুই বুঝিল না। মন-রাখাগোছ কহিল, ‘বোধ হয় পারিব; কিন্তু কাঁটা খুব ছোট ত?’

‘হ্যাঁ, খুব ছোট কিন্তু সাবধান, অনেকখানি বকের রক্ত-মাংস না কাটিলে আর বাহির হইবে না। হয়ত বা প্রাণে বাঁচিব না—সাবধানে তুলিবে ত?’

চার্লস ভয় পাইল। কহিল, ‘তবে ডাক্তার ডাকাও।’

মেরি হাসিল। বলিল, ‘ডাক্তার ডাকিতে লজ্জা বোধ হইবে—বুকের মাঝে কিনা—তাই!’

চার্লস চিন্তা করিয়া কহিল, ‘আমি বোধ হয় পারিব না।’

মেরি ঙ্ৰকুণ্ণিত করিল—‘যদি পারিবে না, তবে মনে মনে লুকাইয়া আমাকে কামনা কর কেন?’

চার্লস শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল ঘরে অপর কেহ নাই; একটু সাহস হইল, বলিল—‘তোমাকে দেবতাও কামনা করেন—আমি ত সামান্য মনুষ্যমাত্র!’

মেরি অন্যমনস্কভাবে কহিল, ‘কিন্তু একজন আমাকে কামনা করে না। সে বোধ হয় দেবতারও উচ্ছে।’ তাহার পর তাহার অন্য ভাবোদয় হইল। অমনি কঠিন কটাক্ষে চার্লসের পানে চাহিয়া বলিল, ‘দেখ, সে কাঁটাটি যদি একবার হাতে পাই, তা হলে এমনি করিয়া পদাঘাত করি—একফোঁটা কাঁটা নিমেষে পরমাণু হইয়া যায়, কিন্তু হাতে পাই না,—বুকের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া আছে!’

চার্লস বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। মনে হইতেছে—বুঝি ঠিক কাঁটার কথা নহে, কিন্তু ভাল পরিকারও হইতেছে না। সাতপাঁচ ভাবিয়া কহিল, ‘ডাক্তার দেখাইলে হানি কি?’

মেরি প্রথমে হাসিয়া ফেলিল কিন্তু পরক্ষণেই মলিন হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, ‘আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই তোমাদের সঙ্গে কথা বলি—সোনার পাত্র ছাড়িয়া আমি মাটির পাত্র লইয়াছি। তৃপ্তি হইবে কেন?’

চার্লসের রাগ হইল কিন্তু ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

মেরি তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসিল, মনে মনে কহিল, ‘এরা আমাকে কত ভয় করে।’

সেদিন সমস্ত দুপুরবেলা সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রে শয্যার উপর জাগিয়া পড়িয়া রহিল। প্রভাতে কোচমানকে ডাকাইয়া বলিল, ‘গাড়ি সাজাও—মিঃ বাথের বাড়ি যাইব।’

মিঃ বাথ ক্যাপ্টান নোলের এটর্নি। মেরি দ্বারে গাড়ি দাঁড় করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বাথ একরাশি কাগজপত্র টেবিলে রাখিয়া কাজ করিতেছিল। মেরিকে সহসা অফিসে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া উপবেশন করাইয়া বলিল, ‘এত সকালে?’

‘কাজ আছে। কর্নেল হ্যারিংটন আমার পিতার নিকট কত টাকা কর্জ লইয়াছিল?’

মিঃ বাথ খাতাপত্র দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল, ‘আট হাজার পাউন্ড।’

‘বেশ! সুদে-আসলে আজ পর্যন্ত তাহা কত হয়, শীঘ্র হিসাব করিয়া দাও।’

সে হিসাব করিয়া বলিল, ‘আজ পর্যন্ত প্রায় বারো হাজার দুই শত পাউন্ড হয়।’

মেরি দন্তে দন্ত টিপিয়া বলিল, ‘খুব ভাল, জেঁক যেমন রক্ত গুষিয়া লয়, তেমনি করিয়া হিসাব করিয়াছ ত?’

বৃদ্ধ ভয় পাইল—বলিল, ‘হাঁ, সেই মত।’

‘আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে আমার এই টাকা চাই—বুঝিলে?’

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। ‘এ কি কথা? সাত দিনের মধ্যে এত টাকা কে দিবে?’

মেরি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, ‘তাহার পুত্র দিবে। না পারে—তাহার বাটী ঘর দ্বার সমস্ত বিক্রি করিয়া লইব।’

বৃদ্ধ ভাবিল, ভিতরে কিছু ঘটয়াছে; তথাপি বলিল, ‘এই সেদিন পুস্তক বিক্রয় করিয়া আমার নিকট দু’ হাজার পাউন্ড জমা দিয়া গিয়াছে। আর তাহার কিছু নাই। সেদিন বলিয়াছিল যে, সম্ভবতঃ আর দুই-তিন বৎসরের মধ্যে বাকি টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু এত তাড়াহুড়া করিলে তাহার বাটী বিক্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই।’

মেরি আগ্রহের সহিত বলিল, ‘বাটী বিক্রয় হইবে?’

‘বোধ হয়।’

‘হয় হউক—উত্তম কথা। আমার টাকা চাই। সাত দিনের মধ্যে—না হয় নালিশ করিও।’

বৃদ্ধ অনেক দেখিয়াছে কিন্তু এমনটি দেখে নাই। বলিল, ‘এত অল্প বয়সে তাহাকে পথের ভিখারী করিবে? কাহাকে দেশত্যাগী করা উচিত কি?’

মেরি চক্ষু রাঙ্গাইল। ‘টাকা তোমার নয়, আমার। আমি তাহাকে পদতলে টানিয়া লইতে চাই।’

শেষ কথাটা বৃদ্ধ ভাল শুনিতে পাইল না, বলিল, ‘কি করিতে চাও?’

‘কিছু না। শুধু টাকা চাই। আজ নোটিশ দাও—ঠিক সাত দিনের দিন।’

দশ

নোটিশ পাইয়া লিওপোল্ডের সমস্ত সংসার অন্ধকার বোধ হইল। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়াও সে কূল দেখিতে পাইল না।

প্রাতঃকালে, মেরি আপনার কক্ষে বসিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু নত করিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া কহিল, ‘নীচে লিও দাঁড়াইয়া আছে।’

মেরি মুখ তুলিয়া বলিল, ‘কে?’

‘লিও।’

‘দূর করিয়া দাও।’ ভৃত্য ভাবিল মন্দ নয়। সে চলিয়া যাইতেছিল—মেরি তাহাকে ডাকিয়া কহিল—‘দাঁড়াও, দূর করিয়া দিও না। সে বড় অভিমানী—অপমান সহিতে পারে না—মিষ্টি কথায় যাইতে বলিও। বলিও, আমি বাড়ি নাই,—দেখিয়ো কিছুতে যেন সে মনে ক্লেশ না পায়, কিছুতে যেন সে বুঝিতে না পারে আমি ইচ্ছাপূর্বক দেখা করিলাম না। বুঝিলে?’

ভৃত্য ঘাড় নাড়িল। সে লিওকে খুব চিনিত;—বাটীর সকলেই চিরকাল তাহাকে সম্মান করিয়াছে; মেরি আজ্ঞা করিলেও কেহ তাহাকে অপমান করিতে পারিত না। সে নীচে চলিয়া গেল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে মেরি ভৃত্যের পশ্চাতে নামিয়া আসিল। ঈষৎ উন্মোচিত দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিল, লিও দাঁড়াইয়া আছে। মুখ বড় শীর্ণ, যেন কিছু পীড়িত। ভৃত্য কহিল ‘তিনি বাটী নাই।’

‘কোথায় গিয়াছেন?’

ভৃত্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, ‘কাল রাত্রে লন্ডন গিয়াছেন।’

‘কবে আসিবেন?’

‘জানি না। বোধ হয় কাল।’

নিকটস্থ একটা চেয়ারের উপর লিও বসিয়া পড়িল। শরীর নিতান্ত পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছিল।

ভৃত্য তাহা অনুমান করিয়া বলিল, ‘বসুন। আপনাকে বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে। এক গ্লাস বিয়ার আনিয়া দিব কি?’

লিও বলিল, ‘না।’

ভৃত্য ছাড়িল না। বলিল, ‘শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে। বিয়ারে উপকার হইবে।’

লিও অল্প হাসিয়া ধন্যবাদ দিয়া কহিল, ‘আমার দুই দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, দুই দিন উপবাসী আছি—তাই এমন বোধ হইতেছে।’

এই সময় কবাট-জোড়াটা খুব দুলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। লিও চাহিয়া দেখিল—‘ও কি!’

ভৃত্যও চাহিল—‘বোধ হয় বাতাস।’

মেরি পা টিপিয়া দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

এই গ্রামে টমাস হগ বলিয়া একজন মহাজন বাস করিত। লিওপোল্ড বরাবর তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিয়া বলিল, ‘হগ, আমার বাটী বিক্রয় হইবে তুমি কিনিবে?’

হগ বিস্মিত হইয়া বলিল, ‘বাটী বিক্রয় করিবে? কেন?’

‘সে কথা না শুনিলে কিনিবে না?’

‘নিশ্চয় নয়। কিন্তু কত টাকায় বিক্রয় করিবে?’

‘তের হাজার পাউন্ড পাইলেই বিক্রয় করিব।’

‘এত টাকা? কি প্রয়োজন?’

‘বলিতেছি। পিতা Captain Noll-এর নিকট আট হাজার পাউন্ড লইয়া বাটী বন্ধক রাখিয়াছিলেন। সুদে-আসলে তাহা প্রায় চৌদ্দ হাজার হইয়াছে। দুই হাজার পাউন্ড পরিশোধ করিয়াছি—আর বারো হাজার বাকি আছে। তাহাই পরিশোধ করিতে চাই।’

Thomas Hogg মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ‘উঃ—তাঁহারা দুজনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তবুও এত সুদ! আমরাও যে এত লই না!’

লিও উত্তর দিল না। বলিল, ‘কিনিবে?’

‘কিনিতে পারি, কিন্তু অত টাকা দিতে পারি না। বারো হাজারের বেশি কিছুতেই নয়।’

লিও চিন্তা করিয়া বলিল, ‘আমার অনেক আসবাব আছে—তা’ ছাড়া এক ঘর পুস্তকও আছে—সমস্ত লইয়াও কি তের হাজার দেওয়া যায় না?’

হগ কহিল, ‘যায়। কিন্তু বাটী বন্ধক আছে—তুমি যে টাকা পরিশোধ করিবে, তাহার প্রমাণ কি?’

লিও হাসিল। ‘আমাদের বংশে কেহ চুরি করে নাই—আমিও চোর নহি। তোমার বিশ্বাস না হয়, আমার সহিত এস, বড তোমার হাতে দিব।’

হগ বিশ্বাস করিল। সমস্ত টাকা গুনিয়া দিয়া বলিল, ‘কাল রেজেষ্ট্রি করিয়া দিও—কিন্তু এক কথা বলি, যদি কখন তোমার টাকা সংগ্রহ হয় আমার নিকট আসিও, তোমার বাটী তোমাকেই ফিরাইয়া দিব।’

সে রাত্রে লিওর পুরাতন ভৃত্য দুইটি বড় বেশি রকম কাঁদিতে লাগিল। আকস্মিক এরূপ সংবাদে তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রত্যেকে ছয় মাসের করিয়া অধিক বেতন পুরস্কার পাইয়াছে, তথাপি কাঁদিতে ছাড়িল না। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধা হইল, বাকি যাহা রহিল, হগের লোক তাহা বুঝিয়া লইল। কাল সপ্তদিন পূর্ণ হইবে, পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া লিও কাল জন্মের মত কোরেল গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে, চিরপুরাতন ভৃত্যেরা তাই কাঁদিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না। লিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছে—যদি বাঁচিয়া থাকি দুই বৎসরের মধ্যে আবার আমার কাছে আসিতে পাইবে। লিওকে তাহারা বাল্যকাল হইতে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত—সেইজন্য কতক শান্ত হইয়াছে।

লিও ভাবিতেছে—জনক-জননীৰ মুখ, মেরি, তাহার জননী, পুস্তকের রাশি, ফুলের বাগান, তাহার চির সহচর ঐ ক্ষুদ্র পাঠাগার—আর ভাবিতেছে মেরি তাহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে।

দুশ্চিন্তা ও নানা কারণে সে রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর বোধ হইল। সমস্ত রাত্রি একরূপ অচেতন্য অবস্থায় কাটিল—দ্বিপ্রহরের পর জ্বরত্যাগ হইল, কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্বল। সামান্য জিনিসপত্র যাহা সাথে লইয়াছিল তাহা স্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া নোটের তাড়া হাতে লইয়া মেরির গৃহে উপস্থিত হইল।

মেরি উপরে বসিয়া ছিল, ভূত্য সংবাদ দিল, ‘লিও টাকা লইয়া আসিয়াছে।’ মেরি Bond লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু টাকার কথায় সে আদৌ বিশ্বাস করে নাই, এবং এজন্য আপনাকেও প্রস্তুত করে নাই। সমস্ত দিন ধরিয়া সে এইরূপ একটা কল্পনা করিতেছিল, সে ভাবিতেছিল আজ তাহার চিরবাস্তিত্ব ধরা দিবে, আজ তাহার উচ্ছৃঙ্খল অতৃপ্তি পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। তখন সে কি করিবে, কেমন করিয়া আপনার গান্ধীর্ষ বজায় রাখিয়া সে সময়ের প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু মাথায় পাতিয়া লইবে, তাহাই স্থির করিয়াছিল। ঋণ পরিশোধ করিয়া লিও যে তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, এ দূরদৃষ্টের এক বিন্দুও তাহার মনে উদয় হয় নাই। লিও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে, কেননা সবাই করিয়াছে। এতদিন যে করিতেছিল না সে কেবল তাহার মূর্খতার ফল।

মেরি উপায়সিদ্ধির জাল বুনিতেছিল, কিন্তু এতদিন তাহা পারিয়া উঠে নাই,—এক দিক বুনিতে অন্য দিকের সুতা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু এতদিনে দুই দিকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া চমৎকার জাল তৈয়ার হইয়াছে, এবার শিকার ধরা পড়িবেই।

কতকটা হুঁচকিতে মেরি নামিয়া আসিল। বসিবার কক্ষে লিও দাঁড়াইয়াছিল। আসিয়াই দেখিল তাহার হাতে একতাড়া নোট রহিয়াছে, মেরি কাঠের মত হইয়া গেল। লিও হাসিয়া হস্তগ্রহণ করিল। মেরি মুখ অবনত করিল। মনে হইল হাত বুঝি বড় উষ্ণ, আর এ হাসি বুঝি উপহার দিবার জন্য কাহারো নিকট চাহিয়া আনিয়াছে।

লিও কহিল, ‘টাকা নাও। আজ সাত দিনের শেষ দিন।’

মেরি হাত পাতিল। লিও একে একে নোটের তাড়া গুনিয়া দিয়া বলিল, ‘হইয়াছে?’

মেরি পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া Bond ফিরাইয়া দিল। একমুহূর্তে তাহার সমুদয় কৌশল, আশা, ভরসা সমস্ত ফাটিয়া গিয়াছে—ভিতরের হৃৎপিণ্ডও ফাটিবার উপক্রম করিতেছে; শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া এ সময়ে সে প্রাণপণে সচেতন রহিল; এ সময়ে অচেতন হইলে চলিবে না।

লিও কহিল, ‘আজ বোধ হয় এই শেষ। শেষ সময়ে তোমাকে দুটো কথা বলিতে চাই, শুনিবে কি?’

মেরি মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘শুনিব।’

‘তবে এ কথাটি রাখিও। কাহাকেও সৎ দেখিয়া শীঘ্র বিবাহ করিও; তোমার অর্থ আছে—অর্থের জন্য ভাবিও না; শুধু সৎ এবং উচ্চ দেখিয়া কাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়ো;—এরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া অরক্ষিতা অবস্থায় বেশি দিন থাকিয়ো না।’

মেরি একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া লিওর মুখপানে চাহিয়া অবনত হইল।

লিও কহিল, ‘আর একটি কথা!’ এই সময়ে দুজনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। ‘আর একটি কথা,—মনে রাখিও, লজ্জা যেমন স্ত্রীলোকের ভূষণ, অভিমানও তাই; কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে বড় কুফল ঘটে।’

এ কথা তাহাকে শিখাইতে হইবে না। জগতের মাঝে এ সত্য আজ মেরি অপেক্ষা বোধ হয় কেহই অধিক বুঝে না।

তারপর পাঁচটা বাজিল, ঘাড়ির পানে চাহিয়া লিও বলিল, ‘তবে যাই—আমার সময় হইয়াছে।’

চলিয়া যায় দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বহু ক্লেশে মেরি কহিল,—‘একটি কথা বলিয়া যাও—’

লিও ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ‘কি কথা?’

‘এত টাকা কোথায় পাইলে?’

লিও মৃদু হাসিল। ‘এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কোন্ কথা তুমি জান না?’

‘কি জানি? অমন গান গাহিতে জান তাহা কি কখন বলিয়াছিলে?’

লিও এবার যথার্থই হাসিয়া ফেলিল—‘কৈ, তুমি ত কখন জিজ্ঞাসা কর নাই? জিজ্ঞাসা করিলে কত গান শুনাইয়া দিতে পারিতাম, এতদিনে হয়ত তুমিও আমার মত শিখিতে পারিতে।’

মেরি কহিল, ‘সে কথা নয়, টাকা কোথায় পাইলে বল?’

‘কোথায় আর পাইব? পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যে তাহাই ব্যয় করিলাম। বাড়ি, ঘর, ফুলবাগান, আমার একরাশি পুস্তক—যাহা কিছু ছিল প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি।’

মেরি কঠিন দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া বলিল—‘বেচিয়াছ?’

‘সব।’

‘থাকিবে কোথায়? খাইবে কি?’

‘আপাততঃ লন্ডনে যাইতেছি—সেখানে কোন কার্য খুঁজিয়া লইব। আশা আছে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইবে না।’

‘লন্ডনে কোথায় থাকিবে?’

‘দিন কতক বোধ হয় হসপিটালে থাকিব, তাহার পর যাহা হয় করিব।’

‘সেখানে কেন?’

‘সেখানে কিছু দিন কাটাইতে হইবে বলিয়া অনুমান করিতেছি। আজ চার দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না,—সদ্য লভনে গিয়া যে ভাল থাকব এ আশাও করি না, টাকাকড়িও সঙ্গে অধিক নাই,—সে অবস্থায় কোথায় আর যাইব বল?’

মেরি শিহরিয়া উঠিল। ‘অ্যাঁ—আজ চার দিনের জ্বর সারে নাই?’

‘কৈ আর সারিয়াছে।’

এক দণ্ডে মেরির সমস্ত মুখের ভাব পরিবর্তন হইয়া গেল। কাতরতা, বিষাদ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান সে-মুখে আর কিছুই রহিল না। শুধু বিশ্বব্যাপী প্রবল স্নেহ ও দিগন্তবিস্তৃত বিপুল শঙ্কা! প্রথমে সে হাত দিয়া লিওর কপোল স্পর্শ করিয়া শরীরের উত্তাপ দেখিল,—ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার পর দুই হস্তে লিওর মুখ নিচু করিয়া নিজের কপোল তাহার কপোলে সংলগ্ন করিয়া উত্তাপের স্তর অনুভব করিল; তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। দৃষ্ট চক্ষুে অমানুষিক আভা।

লিও সভয়ে বলিল, ‘কোথা যাও?’

‘যেখানে ইচ্ছা; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।’

লিও ভাবিল, এ কি!

মেরি বরাবর তাহাকে টানিয়া লইয়া একেবারে উপরে উঠিল, তাহার পর আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। অট্টালিকার মধ্যে এই কক্ষটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সজ্জিত। এক পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড দুর্মূল্য পালঙ্ক সজ্জিত ছিল, মেরি তাহার উপর লিওকে টানিয়া লইয়া বসাইয়া দিল। বালিশগুলি একত্র করিয়া বলিল, ‘চুপ করিয়া এখানে শুইয়া থাক—।’

চক্ষু ও মুখের ভাব দেখিয়া লিও পূর্বেই কিছু ভীত হইয়াছিল, এবার নিতান্ত ভয়ের সহিত বলিল—‘আমাকে যে আজ যাইতে হইবে। সময় উত্তীর্ণ হইতেছে।’

মেরি সে কথা শুনিতে পাইল বলিয়া বোধ হয় না। আপনার মনে একটা বহুমূল্য উষ্ণ শাল আনিয়া তাহার বক্ষ পর্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া বলিল—‘লিও, এ সময়ে আমার সহিত কলহ করিলে চলিবে না। তুমি মনে করিয়াছ, ঋণ পরিশোধ করিয়াছ? কিছুই কর নাই!—আজ নয়, ভাল হও, তাহার পর এ কথা বুঝাইয়া দিব। তোমার যখন শরীর অসুস্থ তখন ও শরীরে আমারই সর্বময় অধিকার, আবার যখন ভাল হইবে তখন যাহা ইচ্ছা করিও—’

লিও স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি কথা! ক্লিষ্ট শরীর মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঢলিয়া আসিতেছিল, অর্ধমুদ্রিত চক্ষে লিও জোর করিয়া কহিল, ‘ছাড়িয়া দাও—আমি লভনে যাইব।’

মেরি তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, ‘লভনের কথা ছাড়িয়া দাও,—আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া শয্যার নীচে নামিলে, আমি এই ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িব। আমার মন এখন পাগলের মত হইয়া আছে,—অবাধ্য হইলেই প্রাণ বিসর্জন দিব।’

লিও ধীরে ধীরে বলিল, ‘তবে আর কি করিয়া যাইব।’ তাহার পর পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

এগার

পনর দিনের মধ্যে লিওর রীতিমত সংজ্ঞা হইল না; পনর দিন মেরি তাহার শয্যা ত্যাগ করিল না।

ডাক্তার বলিল, ‘মেরি, অত পরিশ্রম করিলে তুমিও পীড়িত হইয়া পড়িবে।’

মেরি ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, ‘ডাক্তার মহাশয়, এ সময়ে আমি পীড়ার ভয় করি না। এ স্থান ত্যাগ করিলেই আমার পীড়া হইবে।’

ডাক্তার বলিল, ‘আমি ধাত্রী আনাইয়া দিতেছি—দুইজনে পালা করিয়া শুশ্রূষা কর।’

মেরি মুখখানি আরও মলিন করিয়া বলিল, ‘তাহা হইবে না। এ সময়ে আমার কাহাকেও বিশ্বাস হয় না। গোলাপ ফুল বাসী হইয়াছে, রৌদ্রের তাপে বড় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে—এতটুকু আঘাতেই হয়ত ঝরিয়া যাইবে,—তখন তুমি কি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে?’

নিরুত্তরে ডাক্তার চলিয়া গেল।

রোগ বেশি নহে, তথাপি লভন হইতে তিন-চারজন ডাক্তার মেরির বাটীতে এই পনর দিন ধরিয়া বসিয়া আছে। একদিন তাহারা বলিল, ‘অনর্থক আর কেন আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছ—রোগ সারিয়া গিয়াছে।’

মেরি তাহাদের হাত ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল, ‘ওগো, তোমরা আমার লিওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া আমার হাতে দিয়া—আমার সর্বস্ব লইয়া যাও—মানা করিব না কিন্তু এখন যাইও না—।’

তিন সপ্তাহ পরে লিওপোল্ড উঠিয়া বসিল। ডাক্তার এবং ঔষধের উপদ্রব আর নাই—। মেরি জানালা খুলিয়া দিল—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল,—জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িল—মেরি চাঁদের পানে চাহিয়া সহসা লিওর বুকের উপর আসিয়া পড়িল। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বুকের উপরে অশ্রুসিক্ত করিল, তাহার পর চাঁদের পানে চাহিয়া বলিল, ‘ঐ দেখ, এখনও চাঁদের ভিতর কলঙ্ক বসিয়া আছে,—তোমারও কলঙ্ক তোমার বুকের উপর স্থান পাতিয়া বসিয়াছে,—তাড়াইবে কি করিয়া?’

লিওর চক্ষেও জল আসিল; সংবরণ করিয়া কহিল, ‘কলঙ্কই হউক, শোভাই হউক—বুকের উপর বড় দৃঢ় বসিয়াছে—পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।’

তাহার পর একদিন বসন্ত প্রভাতে কোরেল গ্রামের গির্জায় বড় ধুমধামের সহিত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সমস্ত গ্রামবাসী বড় জাঁকজমকের সহিত প্রফুল্ল মনে সেই দিকপানে ছুটিয়া চলিয়াছে—।

সেখানে কি হইতেছে তোমরা কেহ জিজ্ঞাসা করিবে কি?